না জেনেই বিবাহিত প্রভাষকের প্রেমে...

তখন সবে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেছি। নতুন পরিবেশ, নতুন অভিজ্ঞতা। ছোটবেলা থেকেই নিজের ভেতর নিজেকে রাখতাম বলে হয়তো তেমন বন্ধু-বান্ধব গড়ে ওঠেনি। সময়মতো ভার্সিটি যাওয়া হতো। ক্লাস শেষে বাসা। কখনো দুপুরে ক্যান্টিনে এক কাপ চা। লাইব্রেরিতে সপ্তাহে এক দুবার ঢুঁ দেয়া। মোটের ওপর এই ছিল আমার ভার্সিটি লাইফ।

দ্বিতীয় বর্ষের শুরুতে আমি প্রথম দেখি আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের নতুন লেকচারারকে। সঙ্গত কারণেই নাম উল্লেখ করতে পারছি না, তবে প্রথম দেখাতেই আমি তার প্রতি ভীষণ আকর্ষণ অনুভব করি। তিনি ছিলেন বেশ লম্বা, গায়ের রং শ্যামলা, মাথার চুল কোঁকড়ানো। খুব মিষ্টি করে হাসতেন। বিশেষত আমার পছন্দ ছিল তার কথা বলার ধরন। কণ্ঠস্বর ছিল ভরাট, উচ্চারণ শুদ্ধ। পদার্থ বিজ্ঞানের মতো খটমেটে সাবজেক্ট অপেক্ষা জীবনানন্দ দাশের কবিতা যেন তার স্বরে ভালো মানাত। তিনি আমাদের ক্লাসে এলে আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকে দেখতাম, তার কথা শুনতাম। এমনও হয়েছে আমি অন্য ক্লাসের পেছনের বেঞ্চে বসে তার লেকচার শুনেছি। বহুবার।

আমাদের ডিপার্টমেন্টের টিচার্স রুমের দরজায় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের টেলিফোন বা মোবাইল নম্বর দেয়া থাকত। যেন জরুরি দরকারে তাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করা সম্ভব হয়। আমি পদার্থ বিজ্ঞানের সেই নতুন লেকচারারের ফোন নম্বর সংগ্রহ করি। আমার এখনো স্পষ্ট মনে পড়ে। দিনটি ছিল মঙ্গলবার। রাতে আমি রুমের দরজা আটকে দেই। অকারণেই আমার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল। অনেকক্ষণ মোবাইল হাতে নিয়ে বসে ছিলাম। সাহস করতে পারছিলাম না। অবশেষে মোবাইলের সিম চেঞ্জ করি। ডায়াল করি বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন লেকচারারকে। রাত তখন প্রায় একটা কি দেড়টার মতো হবে। ওপাশে রিং বাজছিল আর আমার বুকে বয়ে যাচ্ছিল তুমুল ঝড়। একবার মনে হলো লাইন কেটে দেই, যখনই কাটব ওপাশে থেকে অপরিচিত কণ্ঠস্বর ভেসে এলো যার জন্য আমি মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না। ওপাশে এক নারী মোবাইল রিসিভ করেছিলেন। আমি কথা বলছিলাম না। কিছুক্ষণ পর ঘুম জড়ানো কণ্ঠে তিনি 'হ্যালো' বললেন। আমি কিছু না বলেই লাইন কেটে দিয়েছিলাম। সেদিনের পর খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম তিনি বিবাহিত। তার বিশ্ববিদ্যালয় জীবনেই তিনি তার সহপাঠীকে বিয়ে করেছিলেন। সেদিনের পর আমি আর যোগাযোগের চেষ্টা করিনি। এমনকি তার ক্লাসগুলোতেও আমার তেমন উপস্থিতি ছিল না।

প্রায় পাঁচ বছর পার হয়েছে সেই ঘটনার। সেদিন ফেসবুক ঘাঁটতে গিয়ে তার আইডি দেখতে পেলাম। তুরস্কের কোনো এক স্থানে ফুটফুটে দুই কন্যা আর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে তোলা ছবি প্রোফাইল পিকচার দেয়া। কেনো জানি ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠানোর সাহস আর করতে পারলাম না। অথচ এক চিরচেনা অনুভূতি হলো। কিছু সম্পর্ক মনের গহিনে নাড়া দিয়ে যায়। বহু বছর পরও।

ইয়াসমিন রুমি, *ঢাকা*

মন খুলে

স্বার্থহীন ভালবাসার এক প্রগাঢ় উৎস

একসময় অনেক ছোট ছিলাম। বাবা আমাকে এক হাতের মধ্যে আগলে রাখতে পারত। ছোটবেলায় বাবা ছিল পাখির মতো, যে পাখির ডানায় ভর করে সারা পৃথিবী ঘুরে আসতে পারতাম। মনে আছে প্রত্যেকদিন ভোরবেলা বাবা আমাকে নিয়ে মেঘাখালি ব্রিজ পেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে যেত বহুদূর... দূরের কোনো গ্রামে। চেনাত ইটভাটা, নদীর পাড়ে মাটি কাটার ভ্যানগাড়ি, ফসলের মাঠ আরো কত কী। আমি অবাক চোখে দেখতাম। দশ বছর পেরোতেই বাবা আমাদের নিয়ে এক বাগানবাড়িতে উঠে গেল। পুকুর ছিল, সবজি ক্ষেত ছিল, এমনকি কয়েকটা ধানের চারাও লাগিয়েছিল সেখানে। শুধু আমাদের দুই বোনকে প্রকৃতির স্বাদ দিতে কত কষ্টই না করেছে বাবা। হ্যাঁ, আমি বড়শি দিয়ে মাছ ধরা শিখেছি, নিড়ানি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বেগুনের চারা লাগাতে শিখেছি, গাছ থেকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে পাকা টমেটো খেতে শিখেছি। দেখেছি ডালিয়া, গাঁদা, গোলাপ, হাসনাহেনা, গন্ধরাজ, শিউলি ফুলের বাহার আমাদের দরজার সম্মুখে। রোজ ভোর ৫টায় উঠে শিউলি ফুল কুড়াতাম আমরা দুই বোন মিলে। আর বাবা পাশে দাঁড়িয়ে নিমের দাঁতন দিয়ে দাঁত খোঁচাত, কী যেন ভাবত সুউচ্চ আকাশমণির সারির মাথায় তাকিয়ে। সত্যি কথা বলতে বাবার মধ্যে বেখেয়ালিপনা ছাড়া একটা খারাপ গুণও চোখে পড়বে না কারো। আজ বাবার থেকে অনেক দূরে পড়ে আছি। সময়ের টানে বদলে গেছে আমাদের জীবন। এখন কত নতুন মানুষের আনাগোনা জীবন জুড়ে। কোনো বন্ধুকে একটা কাজ করে দিতে বললে কতই না অনুরোধ করতে হয়। অথচ বাবাকে এখন পর্যন্ত কোনো কাজ দিলে, না করে দেয় এমন কোনো উদাহরণ দিতে পারি না। বন্ধুকে কাজ করিয়ে ধন্যবাদ দিতে হয়, বাবাকে দিতে হয় না। বন্ধুর সঙ্গে রাগারাগি করে মন খারাপ হয়, বাবার সঙ্গে হয় না। কারণ বাবা তো রাগ করতেই দেয় না। আস্তে আস্তে আমার জগতে ব্যস্ততা বাড়ছে আর বাবার অবসরের সময় হচ্ছে। দিনে ২-১ বার ফোন দিয়ে হয়তো জিজ্ঞেস করা হয়, 'বাবা খেয়েছ, শরীর ভালো?' এটুকুই। বাবার হয়তো ইচ্ছে করে অনেক কিছুই বলতে কিন্তু আর বলা হয় না, হয়তো আমি থাকি ক্লাসে, কিংবা টিউশনিতে, অথবা বন্ধুদের আড্ডায়। এখনো সকাল হলে বাবা হাঁটতে বেরোয়। একদিন বাবার হাত ধরে ঝুলে ঝুলে হাঁটতাম, হাজারো প্রশ্নে বিরক্ত করে তুলতাম। আজ আর বাবাকে কেউ বিরক্ত করে না। বাবার তো ভালোই হয়েছে গাছের সঙ্গে একান্তে কথা বলার সুযোগ পাচ্ছে। যে বোধ কখনো ফিকে হয়ে যায় না, সে বোধ থেকেই সব শেষে বলতে চাই, 'মা যেমন আত্মার স্পন্দন, বাবা তেমন আত্মার অস্তিত্ব, স্বার্থহীন ভালবাসার এক প্রগাঢ় উৎস।'

নাফিজা নাওয়ার, *ড্যাফোডিল বিশ্ববিদ্যালয়*